পার্বত্যকন্যা কনকচাঁপা চাকমা

সংশপ্তক হাসান

এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী শিল্পী কনকচাঁপা চাকমা। ছবি আঁকার বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন তিনি। ক্যানভাসে তুলে ধরছেন পাহাড় ও সমতলের জীবনযাত্রার বৈপরীত্য। শিল্প-সাহিত্যে অবদান রাখায় এই পার্বত্য কন্যাকে সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এ সম্মাননা পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত কনকচাঁপা। চলুন আজ জেনে নেই এই গুণী চিত্রশিল্পীর উঠে আসার গল্প ও তার জীবন দর্শন। কনকচাঁপার জন্ম লাল পাহাড়ের দেশ রাঙামাটি। তিনি ১৯৬৩ সালের ৬ মে রাঙামাটির তাবালছড়ি নামের সবুজ ঘেরা ছোট্ট এক শহরের চাকমা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। আর মা ছিলেন একজন ডিজাইনার।

প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন কনকচাঁপা। বড় হয়েছেন পাহাড়ের বুকে। তার শৈশব জুড়ে আছে পাহাড়ী হাওয়া, জুম চাষীর গান আর নৃগোষ্ঠীর স্বকীয়তা। কনকচাঁপার ভিতর শিল্পীসত্ত্বা উঁকি দিয়েছিল শৈশবে। আর এই গুণটি জিনগত ছিল। তার মা ছিলেন একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ডিজাইনার। কাপড়ের ক্যানভাসে সুই সুতায় জীবন্ত করে তুলতেন নানা রকম নকশা। ছোটবেলায় কনকচাঁপা মায়ের কাছে বসে সেই সব কারুকাজ বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতেন। দেখতে দেখতে তার ভিতরও বেড়ে উঠছিল এক আঁকিয়ে সত্ত্বা। তবে মায়ের পথে হাঁটেননি তিনি। সুই সুতা হাতে না নিয়ে তুলে নেন রংতুলি। আর কাপড়ের বদলে বেছে নেন ক্যানভাস।

কনকের ওপর প্রভাব ফেলেছিল নিখাদ প্রকৃতি। পাহাড়ী ঝরনার নির্মল সৌন্দর্য, নিটোল সবুজ। এসব যেন আরও সৃজনশীল করে তুলেছিল তাকে। সেইসঙ্গে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা পার্বত্যবাসীদের সংগ্রামী জীবন তো ছিল তার খুব কাছে থেকে দেখা। এই বিষয়গুলোই মূলত তাকে রসদ জুগিয়েছিল শিল্পী হয়ে উঠতে। আর এটিই পূর্ণতা পায় তার মায়ের হাত ধরে। এভাবেই ধীরে ধীরে আঁকিয়ে হয়ে বেড়ে উঠছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত ছবি আঁকতেন কনকচাঁপা। হাতের কাছে যা দেখতে পেতেন তাই রঙিন করে তুলতেন রংতুলিতে।

চিত্রশিল্পী হিসেবে তখন থেকেই যে মেধার স্বাক্ষর রেখে আসছিলেন সে কথা কনকচাঁপা নিজেই জানিয়েছেন। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছবি এঁকে সম্মাননা পাওয়ার শুরুটা তার ছোট থেকেই। শৈশবে ছবি এঁকে একাধিক পুরস্কার জিতেছেন স্কুল থেকে। চলার পথটা শুরু সেখান থেকেই। নিজের ছবিতে সমৃদ্ধ করেছেন শহরের প্রদর্শনশালা। সীমানা পেরিয়ে নিজের ছবির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের। তবে সে পথ চলাটা এত সহজ ছিল না। কেননা পার্বত্য জীবনে অভ্যস্ত কনকচাঁপার এই সমতলে টিকে থাকা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। তাই যোগ্যতায় পরিপূর্ণ থাকলেও ভিতরে ধুকপুকানি ঠিকই ছিল। পরে অবশ্য জয় কনকচাঁপারই হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য এ শিল্পী ভর্তি হয়েছিলেন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে অন্য কোনো বিষয় না, পড়ার টেবিলে তিনি টেনে নিয়েছিলেন ওই আঁকাআঁকিই। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। ১৯৮৬ সালে সেখান থেকে ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কনকচাঁপা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা শেষ করে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে চিত্রকলায় উচ্চশিক্ষা নিতে ভর্তি হন পেনিসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন তিনি। সেখান থেকে পান মিড আমেরিকান আর্টস এলায়েন্স ফেলোশিপ। কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করে দেশে ফেরেন তিনি।

কনকচাঁপার চাকমা সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে গভীর প্রেম। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরবেন তার শিল্পকর্মে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে পড়াবস্থায় তিনি দেখতেন শিক্ষার্থীরা অ্যাবস্ট্রাক্টস আর্টে তুলে ধরতেন সমতলের বিষয়বস্তু। এসব দেখে কনকচাঁপা ভাবনা আসে, যেহেতু তিনি একটি ভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন তার জীবনধারায়, শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও ভিন্ন চিহ্ন বহন করছেন। ছবি আঁকার জগতেও একটি নির্দিষ্ট স্বকীয়তা গড়ে তুলবেন তিনি। যাতে করে তার কাজই তাকে আলাদা করে তোলে অন্যদের সৃষ্টি থেকে। পাশাপাশি স্বগোত্রের চারণভূমি ও জীবনধারাকে তুলে ধরতে পারবেন বিশ্বের বুকে।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার শিল্পকর্ম হবে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও সংগ্রামের চিত্র। দেশ ও বিশ্বের বুকে আদিবাসীদের জীবন, সংগ্রাম ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন কনকচাঁপা। আমরা পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন মাধ্যমে আদিবাসীদের কথা জানতে পারলেও পরিধিতে তা ছিল বেশ সীমিত। একে চিত্রকর্মের মাধ্যমে সমতলের মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। তার ক্যানভাসে পাহাড়ি জীবনের নানা বিষয় উঠে এসেছে। আদিবাসীদের জীবন-যাত্রা, সংস্কৃতি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না রংতুলির আচড়ে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তার ক্যানভাস দেখেই নৃগোষ্ঠীদের প্রতি আগ্রহ জেগেছে সমতলের। তাদের জীবনধারার সাথে মেশার ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও স্বজাতির ওপর করা তার চিত্রকর্ম হয়েছে প্রশংসিত।

রংতুলিতে নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্বই শুধু কাঁধে নেননি কনকচাঁপা। পাহাড়ের পরবর্তী প্রজন্মদের তুলে আনতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই শিল্পী। কাজ করে যাচ্ছেন সেই লক্ষ্যে। গেল চার-পাঁচ বছরে আদিবাসীদের মধ্যে যারা শিল্পী হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সনদ পেয়েছেন তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ করেছেন তিনি। তাদের গড়ে তুলতে নিজেই মাঠে নেমেছেন। নিজের উত্তরসুরীদের নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় যাচ্ছেন। পার্বত্যবাসীদের জীবনধারা ক্যানভাসে তুলে আনতে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে তাদের ছবি প্রদর্শনী ও বিক্রিতে করছেন সহায়তা। তবে কনকচাঁপা মনে করেন, এই উদ্যোগের পরিধি আরও বাড়ানো উচিত। তিনি মনে করেন সামগ্রিকভাবে কাজটি করতে পারলে পাহাড়ি শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের সৃষ্টিগুলোও হয়ে উঠবে আরও পরিণত।

দেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম কনকচাঁপা। অভিজ্ঞতার ঝুলিও বেশ পরিপূর্ণ। তিনি জানেন একজন মানুষের শিল্পী হয়ে উঠতে তার ভিতরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কনকচাঁপা বিশ্বাস করেন প্রতিভা, মনন, অদম্য ইচ্ছাশক্তি যদি জাগ্রত না থাকে তাহলে শুধু ক্যানভাস না শিল্পের কোনো শাখায়ই বিচরণ করা সম্ভব হবে না। তাই তার উপদেশ, মনের ভিতর লুকিয়ে থাকা অদম্য ইচ্ছাটা পুষে রাখতে হবে। তবেই একজন মানুষ পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠবে।

দেশ বিদেশে একশর মতো চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে কনকচাঁপা চাকমার। অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়ার বড় বড় প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তার ছবি। হয়েছে প্রশংসিত। তবে শুধু প্রশংসার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি গুণী এই চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্ম। পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে বেস্ট অব দ্য শো, মিউজিয়াম অব আমেরিকা, চীনের অলিম্পিক ফাইন আর্ট মেডেল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড বেস্ট পেইন্টিং, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। সবশেষে পেয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ একুশে পদক। এই সম্মাননায় ভূষিত হয়ে শিল্পী আনন্দিত। তিনি মনে করেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংস্কৃতিকে রংতুলির মাধ্যমে তুলে এনেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। তার ক্যানভাস দেখেই মানুষ সমতল ও পাহাড়ি সাংস্কৃতির বৈপরীত্য চিহ্নিত করেছে। মূলত এই বিষয়টি তাকে যোগ্য করে তুলেছে একুশে পদকের জন্য।

ক্যারিয়ারে অপ্রাপ্তি নেই কনকচাঁপার। তিনি বিশ্বাস করেন যতটা প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে বেশিই পেয়েছেন তিনি। তাই সম্মাননা ও প্রাপ্তির লোভ আর টানে না তাকে। যে জিনিসটা টানে তা হলো শুধুই আঁকাআঁকি। যতদিন বাঁচবেন ততদিনই ক্যানভাসের সাথে থাকতে চান তিনি। নতুন প্রজন্ম নিয়েও কিছু করার আছে তার। উত্তরসুরীদের কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে যেতে পারলেই তৃপ্তি পাবেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা খালিদ মাহমুদ মিঠুর স্ত্রী ও দুই সন্তনের জননী। তারাও শিল্পজগতের বাসিন্দা। তবে তাদের বিচরণ অভিনয় ও সংগীতে।